আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল: গুরুত্ব ও তাৎপর্য

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

আব্দুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

৪০৩২

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

فقه التوكل

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

IslamHouse.com

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

তাওয়াক্কুল কী?

তাওয়াক্কুল আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো, ভরসা করা, নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থ হলো: আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা। ইসলামে আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একটি ইবাদত। তাই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ওপর তাওয়াক্কুল করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাওয়াক্কুল নিবেদন করা যাবে না। মৃত বা জীবিত কোনো ওলী, নবী-রাসূল, পীর-বুযুর্গের ওপর ভরসা করা বা তাওয়াক্কুল রাখা শির্ক।

একজন ঈমানদার মানুষ ভালো ও কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য সকল ব্যাপারে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করবে, সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে আর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করবে, তাঁর প্রতি আস্থা ও দৃঢ় ইয়াকীন রাখবে। বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ যা লিখে

রেখেছেন ফলাফল তা-ই হবে। আর তাতেই রয়েছে কল্যাণ চূড়ান্ত বিচার ও শেষ পরিণামে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি আমরা তা অনুধাবন না-ও করতে পারি। এটাই তাওয়াক্কুলের মূলকথা।

তাওয়াক্কুলের নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না। আশা ভঙ্গ হলে মুষড়ে পড়ে না। বিপদ-মুসীবত, যুদ্ধ-সংকটে ঘাবড়ে যায় না। যে কোনো দুর্বিপাক, দুর্যোগ, সঙ্কট, বিপদ-মুসীবতে আল্লাহ তা'আলার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকারে আশা করে উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের। যত যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের ঝড়-তুফান আসুক, কোনো অবস্থাতেই সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না।

তাই আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল হলো তাওহীদের একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡأَحۡزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥۚ وَمَا زَادَهُمۡ إِلَّآ إِيمَٰنٗا وَتَسۡلِيمٗا ٢٢﴾ [الاحزاب: ٢٢]

“আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন’। এতে তাদের ঈমান ও ইসলামই বৃদ্ধি পেল।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২২]

﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ١٧٣ فَٱنقَلَبُواْ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ لَّمۡ يَمۡسَسۡهُمۡ سُوٓءٞ وَٱتَّبَعُواْ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَظِيمٍ ١٧٤﴾ [ال عمران: ١٧٣، ١٧٤]

“যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, ‘নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর’। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা

বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক’! অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহসহ। কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করে নি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩-১৭৪]

﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٧]

“আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার ওপর যিনি মরবেন না।” [সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৫৮]

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ [ابراهيم: ١١]

“আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১১]

﴿فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾ [ال عمران: ١٥٩]

“অতঃপর তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কর।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾ [الطلاق: ٣]

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৩]

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ٢﴾ [الانفال: ٢]

“মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।” [সূরা আল আনফাল, আয়াত: ২]

এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারি:

এক. প্রথম আয়াতে খন্দকের যুদ্ধকালে মুসলিমদের ঈমানী অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম হিজরী মোতাবেক ৬২৭ ইং সনে যখন মদিনার আশে পাশের ও মক্কার কাফিররা মদিনা ঘেরাও করে ফেলল মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমরা সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তুলল। তখন অস্তিত্বের এই সীমাহীন সংকটকালেও তারা সামান্যতম হীনমন্য হয় নি। বরং ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তির এই প্রবল ও সর্বব্যাপী আগ্রাসন দেখে তারা ভীত-বিহ্বল না হয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কাফিরদের এ ব্যাপক আগ্রাসন দেখে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছিল। হয়েছিল আরো দৃঢ়, আরো মজবুত। তারা মনে করেছিল, যখন আমরা ঈমান এনেছি তখন ঈমানের পরীক্ষা তো দিতেই হবে। এটা যেমনিভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন তেমনি ওয়াদা করেছেন তাঁর রাসূলও। এ অবস্থায় যেমন

তাদের ঈমান সুদৃঢ় হয়েছিল, তেমনি ইসলাম আরো সুন্দর, আরো মজবুত হয়েছিল।

আজ আমাদের অধিকাংশ মুসলিমের কাছে এ আয়াতের শিক্ষা অনুপস্থিত। আমরা যখন দেখি বিশ্বের অমুসলিম জাতি ও পরাশক্তিগুলো আমাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, তখন আমরা ভীত-বিহবল হয়ে যাই, হীনমন্য হয়ে পড়ি। তাদের সন্তুষ্ট করতে নিজের দেশের লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি। মুসলিমদের ধরে ধরে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেই। ইসলাম ও ঈমানকে মুলতবী করার চেষ্টা করি। ভাবতে থাকি, এ মুহূর্তে ইসলামের এটা বলা যাবে না। ওটা করা যাবে না। আগ্রাসীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করি। এগুলো সবই মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয়। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত জাতি শক্তিশালী হলেও শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ছিল অন্য রকম। এমন সংকটকালে তারা দৃঢ় ঈমান ও মজবুত

ইসলামের পরিচয় দেবে। তারা মনে করবে আমরা যখন ইসলামের অনুসারী তখন অমুসলিম শক্তি কখনো আমাদের অস্তিত্ব মেনে নেবে না। তাদের আগ্রাসনটাই স্বাভাবিক। তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

দুষ্ট বালকেরা রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় সব গাছের প্রতি ঢিল ছুড়ে না। যে সকল গাছে ফল আছে সে সকল গাছেই ছুড়ে। মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে, ইসলাম নামক ধর্মের ফল-ফুল দিয়ে সমৃদ্ধ। দুষ্ট লোকেরা তাই তাদের নির্মূল করতে প্রয়াস চালায়। তাদের দেখা মাত্র ঢিল ছুড়ে।

ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ধেয়ে আসলে মুসলিম নেতারা যুদ্ধ করা ছাড়াই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। তখন আল্লাহ কী বলেছেন, তাঁর রাসূল কী করেছেন তার দিকে তাকানোর সময় তারা পায় না। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রাখার বা তাওয়াক্কুল করার সাহস পায় না। ভালো কথা, কিন্তু বাস্তবতার প্রতি খেয়াল করার সুযোগ

কি তাদের হয় না। তারা কি দেখতে পায় না, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষের দল ভাঙ্গা-চোরা অস্ত্র দিয়ে কত বড় বড় শক্তিকে পরাজিত করে শূণ্য হাতে ফেরত পাঠিয়েছে?

কাফেরদের হুমকি, হামলা, অবরোধের মুখে যদি কারো ঈমান দৃঢ় না হয়, বৃদ্ধি না পায়, তাহলে সে যেন নিজেকে দুর্বল মুমিন হিসেবে ধরে নেয় এবং নিজের ঈমানের চিকিৎসা করাতে উদ্যোগী হয়। আলোচিত আয়াত তো আমাদের এমনটিই বলছে।

দুই. দ্বিতীয় আয়াতটিও প্রায় একই বিষয় সম্পন্ন। অর্থাৎ কাফিরদের আক্রমণের মুখে মুমিনদের ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও আস্থা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয় ঘটেছিল মারাত্মকভাবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধে নিজে আহত হয়েছিলেন। তার অনেক প্রিয় সাহাবীকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। এক হাজার মুজাহিদের মধ্যে সত্তর জন্য শহীদ হয়ে গেলেন। আহত হলেন আরো

অনেক। যুদ্ধের পর চলছিল মদিনার ঘরে ঘরে শোক। আর আহত মুজাহিদদের কাতরানি। এমতাবস্থায় খবর এল, কাফির বাহিনী আবার মদীনাপানে ধেয়ে আসছে। অবশিষ্ট জীবিত মুসলিমদের সকলকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছে। এ খবর শুনে মুসলিমগণ পলায়ন বা আত্মসমর্পণের চিন্তা না করে উঠে দাঁড়ালেন। ভীত বা শংকিত হওয়ার বদলে পুনরায় রওয়ানা দিলেন কাফির বাহিনীর মোকাবেলা করতে। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও মজবুত তাওয়াক্কুল নিয়ে অভিযানে বের হলেন। আহত মুজাহিদদের অনেকে খুড়িয়ে খুড়িয়ে অভিযানে শরীক হলেন। পরিণতিতে তারা বিজয়ী হলেন। আর কাফিররা গেল পালিয়ে। ইসলামের ইতিহাসে এ অভিযানের নাম হামরাউল আসাদ অভিযান। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা‘আলা বললেন, যখন তাদের ভয় দেখানো হলো, কাফিররা আবার ফিরে আসছে তোমাদের শেষ করতে, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেল। তারা বলল, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট...।

এ আয়াত থেকে শিক্ষা হলো, কাফির শক্তির হামলা, অবরোধ, হুমকি-কে ভয় না করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিন. কেউ যদি এ অবস্থায় আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল করতে পারে, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে নি'আমত, প্রতিদান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। যেমন লাভ করেছিলেন হামরাউল আসাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীবৃন্দ। এ ধরনের আগ্রাসন, সংকট ও বিপদে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আস্থা ও তাওয়াক্কুল বেড়ে যায়, তাদের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে।

চার. তাওয়াক্কুল তো এমন সত্তার ওপর করা উচিত, যিনি চিরঞ্জীব। তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ওপর তাওয়াক্কুল করা জায়েয নয়। তাওয়াক্কুল একটি ইবাদত। যেমন, আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল

করতে আদেশ করেছেন। এটা শুধু আল্লাহর জন্যই নিবেদন করতে হয়। যদি কেউ এমন কথা বলে, 'চিন্তা নেই, আল্লাহর রাসূল শাফা'আত করে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।' তাহলে সে আল্লাহর রাসূলের ওপর তাওয়াক্কুল করে শির্ক করল। এমনিভাবে যদি কেউ বলে আমি আব্দুল কাদের জিলানীর ওপর ভরসা রাখি। তাহলে সে শির্ক করল। তাওয়াক্কুল-ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপরই করতে হবে।

পাঁচ. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখা মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য।

ছয়. আল্লাহ তাঁর রাসূল-কেও তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সাত. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন। সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা লাভের একটি কার্যকর উপায় হলো তাওয়াক্কুল।

আট. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারীর সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

নয়. সূরা আনফালের উল্লিখিত আয়াতে ঈমানদারদের তিনটি গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে।

(১) যদি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

(২) যখন তাঁর আয়াত বা বাণী তিলাওয়াত করে অথবা শুনে তখন এতে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। ঈমান আরো দৃঢ় হয়।

(৩) তারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে। পরবর্তী আয়াতে আরো দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তাহল, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে- আল্লাহর পথে দান-সদকা করে। সূরা আনফালের দুই ও তিন নম্বর আয়াতে ঈমানদারদের গুরুত্বপূর্ণ এ পাঁচটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

যাদের এ গুণগুলো আছে তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ গুণগুলো অর্জন করার তাওফীক দান করুন।

হাদীস- ১. আব্দুললাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«عُرِضَت عليَّ الأمَمُ، فَرَأَيْت النَّبِيَّ وَمعَه الرُّهيْطُ والنَّبِيَّ ومَعهُ الرَّجُل وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبِيَّ وليْسَ مَعهُ أحدٌ إذ رُفِعَ لِي سوادٌ عظيمٌ فظننتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لى انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي : هَذه أُمَّتُكَ، ومعَهُمْ سبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ» ثُمَّ نَهَض فَدَخَلَ منْزِلَهُ، فَخَاض النَّاسُ في أُولَئِكَ الَّذينَ يدْخُلُون الْجنَّةَ بِغَيْرِ حسابٍ وَلا عذابٍ، فَقَالَ بعْضهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذينَ صَحِبُوا رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وقَال بعْضهُم : فَلعَلَّهُمْ الَّذينَ وُلِدُوا في الإسْلامِ، فَلَمْ يُشْرِكُوا بالله شيئاً وذَكَروا

أشْياء فَخرجَ عَلَيْهمْ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّم فقَالَ : «مَا الَّذي تَخُوضونَ فِيهِ ؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ : «هُمْ الَّذِينَ لا يرقُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطيَّرُون، وَعَلَى ربِّهمْ يتوكَّلُونَ» فقَامَ عُكَّاشةُ بنُ محْصن فَقَالَ : ادْعُ اللَّه أنْ يجْعَلَني مِنْهُمْ، فَقَالَ : «أَنْت مِنْهُمْ» ثُمَّ قَام رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : ادْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

“আমার সম্মুখে সকল উম্মতকে পেশ করা হলো। (এভাবে যে,) আমি একজন নবীকে ছোট একটি দলসহ দেখলাম। কয়েকজন নবীকে একজন বা দু’জন অনুসারীসহ দেখলাম। আরেকজন নবীকে দেখলাম তার সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে আমাকে একটি বড় দল দেখানো হলো। আমি মনে করলাম এরা হয়ত আমার উম্মত হবে। কিন্তু আমাকে বলা হলো, এরা হলো মূসা আলাইহিস সালাম ও তার উম্মত। আমাকে বলা হলো, আপনি অন্য প্রান্তে তাকান। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি দল। আবার আমাকে বলা হলো,

আপনি অন্য প্রান্তে তাকান। তাকিয়ে দেখলাম, সেখানেও বিশাল এক দল। এরপর আমাকে বলা হলো, এসব হলো আপনার উম্মত। তাদের সাথে সত্তর হাজার মানুষ আছে যারা বিনা হিসেবে ও কোনো শাস্তি ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা সেসব মানুষ (যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে) তারা কারা হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিল। কেউ বলল, এরা হচ্ছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছে। আবার কেউ বলল, এরা হবে যারা ইসলাম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে কখনো শরীক করে নি, তারা। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছ? সাহাবীগণ আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করেনা। ঝাড়-ফুঁক চায় না। কোনো কুলক্ষণে-শুভাশুভে বিশ্বাস করে না এবং শুধুমাত্র নিজ রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে।" এ কথা শুনে উক্কাশা ইবন মিহসান দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর আরেকজন উঠে বলল, আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।"[1]

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল:

---

[1] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এক. কেয়ামত সংঘটিত হবার পর হাশরের ময়দানে যা ঘটবে, তার কিছু চিত্র আল্লাহ আহকামুল হাকেমীন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়েছেন।

দুই. হাশরের ময়দানে উম্মতের সংখ্যার বিচারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে তিনি উম্মাতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবেন।

তিন. অনেক নবী এমন হবেন, যাদের কোনো অনুসারী থাকবে না। এটাকে তাদের ব্যর্থতা বলে গণ্য করা হবে না। কারণ, তারা উম্মাতের হিদায়াতের জন্য যথাসাধ্য মেহনত করেছিলেন। ফলাফল তো তাদের আয়ত্বে ছিল না।

চার. উম্মতে মুহাম্মাদীর থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে। কারণ, তারা তাওয়াক্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেছে।

পাঁচ. তাদের তাওয়াক্কুলের প্রকাশ ছিল এমন যে, তারা কারো ঝাড়-ফুঁক করে নি। ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারো কাছে যায় নি। তারা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে নি। অন্য বর্ণনায় আরেকটি গুণের কথা আছে। আর তা হলো, তারা আগুনের ছ্যাকা দেয় নি।

ছয়. ইসলাম কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করা অনুমোদন করে না। মানুষের সমাজে অনেক অশুভ লক্ষণের ধারনা আছে। যেমন, কালো বিড়ালকে অশুভ ভাবা হয়। তের সংখ্যাকে অশুভ ধরা হয়। কোনো কোনো তারিখকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। কখনো কখনো পশু পাখির হাক ডাককে অশুভ ধারনা করা হয় ইত্যাদি। যত প্রকার অশুভ লক্ষণ বলে মানুষ ধারণা করে, সব ইসলাম বাতিল করে দিয়েছে।

সাত. ঝাড়-ফুঁক দু ধরণের। শরী‘আত অনুমোদিত ঝাড়-ফুঁক আর শরী‘আত পরিপন্থী ঝাড়-ফুঁক। যে সকল ঝাড়-ফুঁক কুরআন বা সহীহ হাদীস অনুযায়ী হবে তা জায়েয।

আর যা এর বাহিরে হবে তা শির্ক বলে বিবেচিত হবে। যারা জায়েয ঝাড়-ফুঁক-কেও পরিহার করে চলে এ হাদীসে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে । না জায়েয ঝাড়-ফুঁকতো শুধু তাওয়াক্কুলেরই খেলাফ নয়। তা তাওহীদেরও খেলাফ। এ হাদীসে যে ঝাড়-ফুঁককে তাওয়াক্কুলের খেলাফ বলা হয়েছে তাহল জায়েয ঝাড়-ফুঁক। আর না জায়েয ঝাড়-ফুঁক করলে তো তাওয়াক্কুল দূরের কথা ঈমানই থাকে না।

আট. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করার বৈধতা প্রমাণিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথা ও বাণী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বাধা দেন নি। বরং সেই সত্তর হাজার লোক কারা হবে, তা প্রথমে বলেন নি। বিষয়টি গোপন রেখে তাদের গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করেছেন।

নয়. যে সকল ঝাড়-ফুঁক বৈধ, তাহল, কুরআনের আয়াত, হাদীসে বর্ণিত কোনো দো‘আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। কেউ এ রকম ঝাড়-ফুঁক করলে কোনো গুনাহ হবে না। যদি কেউ ঝাড়-ফুঁকের জন্য আসে তখন তাকে বৈধ পন্থায় ঝাড়-ফুঁক না করে ফিরিয়ে দেওয়াও ঠিক হবে না।

দশ. ভালো কাজে সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা করতেন। কেউ পিছনে থাকতে চাইতেন না। উক্কাশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দো‘আ চাওয়া ও অন্যান্য সাহাবীদের এ মর্যাদা কামনা করার মাধ্যমে এটা আমাদের বুঝে আসে।

এগার. কোনো নেককার আলিম, বুযুর্গ ব্যক্তিকে ‘আমার জন্য দো‘আ করুন’ বলা না জায়েয নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ রকম বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর সাহাবীগণ এ রকম বলতেন। যেমন, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে

বলেছিলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে আমরা দো‘আ করার সময় তার উসীলা নিতাম। মানে তাকে দো‘আ করতে বলতাম। এখন তিনি নেই। আমরা আপনার উসীলা নিচ্ছি, বৃষ্টির জন্য আপনাকে দো‘আ করতে অনুরোধ করছি।

হাদীস- ২. ইবন আব্বাস রাদিয়াললাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

«اللَّهُم لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإِلَيكَ أَنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ. اللَّهمَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنت الْحيُّ الَّذي لا تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ».

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার ওপরই ঈমান এনেছি। আপনার ওপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেছি। আপনার দিকেই মনোনিবেশ করেছি। আপনার জন্যই তর্ক করেছি। হে আল্লাহ! আপনার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি -আর

আপনি ছাড়াতো কোনো উপাস্য নেই- যেন আমাকে পথভ্রষ্ট না করেন। আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যিনি মারা যাবেন না। আর মানুষ ও জিন্ন মারা যাবে।”[2]

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা যে সকল দো‘আ করতেন তার মধ্যে একটি হলো:

«اللَّهُم لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعَلَيْكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أَنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ. اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْتَ الْحيُّ الَّذي لا تـَمُوتُ، وَالجِْنُّ وَالإِنْسُ يَموْ تُوْنَ»

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো‘আতে বলেছেন, আমি আপনার ওপরই তাওয়াক্কুল করলাম। এ কথা থেকে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা ও তার ঘোষণা দেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

---

[2] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

তিন. আমাদের সকলের উচিত দো‘আটি মুখস্থ করে নেওয়া ও সময় সুযোগমত অর্থ বুঝে পাঠ করা।

হাদীস- ৩. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«حسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الْوكِيلُ قَالَهَا إبْراهِيمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حينَ أُلْقِيَ في النَّارِ، وَقالَها مُحَمَّدٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حيِنَ قَالُوا: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيماناً وقَالُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكِيلُ » رواه البخارى

وفي رواية له عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما قال : «كَانَ آخِرَ قَوْل إبْراهِيمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ أُلْقِي في النَّارِ «حسْبِي اللَّهُ وَنِعمَ الْوَكِيلُ».

“ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি বললেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক)। আর লোকেরা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের বলল, (শত্রু বাহিনীর) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে, তাই তোমরা তাদের ভয় কর, তখন তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম অভিভাবক)।"[3]

ইবনে আব্বাস থেকে বুখারীর আরেকটি বর্ণনায় আছে, "আগুনে নিক্ষেপকালে ইবারহীম আলাইহিস সালামের শেষ কথা ছিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম অভিভাবক)।"

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নিমাল ওয়াকীল দো'আটির ফজিলত প্রমাণিত হলো। এ দো'আটি যেমন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম চরম বিপদের মুহূর্তে পাঠ করেছিলেন। তেমনি সাইয়েদুল

---

[3] সহীহ বুখারী।

মুরাসলীন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিপদের সময় তা পাঠ করেছেন।

দুই. মানুষের পক্ষ থেকে আগত আঘাত, আক্রমণ ও বিপদের সময় এ দো‘আটি পাঠ করা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি তাওয়াক্কুলের একটি বড় প্রমাণ। তাইতো যখন মানুষেরা ইবারহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি এ দো‘আটি পড়েই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের প্রমাণ রেখেছিলেন। একইভাবে উহুদ যুদ্ধের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির পর যখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম আবার শত্রু বাহিনীর আক্রমণের খবর পেলেন, তখন তারা এ দো‘আটি পাঠ করে আল্লাহর ওপর নির্ভেজাল তাওয়াক্কুলের প্রমাণ দিয়েছেন।

তিন. এ দো‘আটি আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, তিনি তাঁর পবিত্র কালামে এ দো‘আ পড়ার ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। আর যারা এটি পড়েছে তাদের প্রশংসা করেছেন।

চার. শত্রুর পক্ষ থেকে আগত ভয়াবহ বিপদ বা আক্রমণের মুখে এ দো'আটি সে-ই পড়তে পারে যার ঈমান তখন বেড়ে যায়। যে পাঠ করে তার ঈমান যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ও বুঝা যায়।

পাঁচ. দো'আটি পাঠ করতে হবে অন্তর দিয়ে। অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এমনভাবে পাঠ করেছিলেন বলেই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এমনভাবে পাঠ করতে পেরেছিলেন বলেই তো তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছিল, ফলে শত্রুরা ভয়ে পালিয়েছিল। এমন যদি হয় যে, শুধু মুখে বললাম, কন্তু কি বললাম তা বুঝলাম না। তাহলে এতে কাজ হবে না বলেই ধরে নেওয়া যায়।

৬- 'হাসবুনাল্লাহ' আর 'হাসবিআল্লাহ' এর পার্থক্য হলো এক বচন ও বহু বচনের। প্রথমটির অর্থ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, আল্লাহ

আমার জন্য যথেষ্ট। এক বচনে হাসবি আল্লাহ.. আর বহু বচনে হাসবুনাল্লাহ... বলতে হয়। ইবারহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন একা। তাই তিনি হাসবি আল্লাহ... বলেছেন।

হাদীস- ৪. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

«يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدتُهُمْ مِثْلُ أفئدة الطَّيْرِ » رواه مسلم. قيل معْنَاهُ مُتوَكِّلُون، وقِيلَ قُلُوبُهُمْ رقِيقةٌ.

"জান্নাতে এমন কিছু সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মত হবে।"[4]

[4] সহীহ মুসলিম।

অন্তর হবে পাখিদের অন্তরের মতো। এর অর্থ হলো, তারা পাখিদের মত তাওয়াক্কুলকারী বা তারা কোমল হৃদয়ের মানুষ।

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. 'যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মত হবে' এ কথার অর্থ হলো অন্তরের দিকে দিয়ে পাখি যেভাবে আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল করে, তারাও তেমনি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করত।

পাখিরা আল্লাহর ওপর কিভাবে তাওয়াক্কুল করে সে সম্পর্কিত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস সামনে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই. এ হাদীসের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল করার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

হাদীস- ৫. জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قفَل رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَفَل مَعهُمْ، فأدْركتْهُمُ الْقائِلَةُ في وادٍ كَثِيرِ الْعضَاهِ، فَنَزَلَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وتَفَرَّقَ النَّاسُ يسْتظِلُّونَ بالشجر، ونَزَلَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تَحْتَ سمُرَةٍ، فَعَلَّقَ بِهَا سيْفَه، ونِمْنَا نوْمةً، فإذا رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يدْعونَا، وإِذَا عِنْدَهُ أعْرابِيٌّ فقَالَ : «إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سيْفي وأَنَا نَائِمٌ، فاسْتيقَظتُ وَهُو في يدِهِ صَلْتاً، قالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ منِّي ؟ قُلْتُ : اللَّه ثَلاثاً » وَلَمْ يُعاقِبْهُ وَجلَسَ».

“তিনি নজদ অঞ্চলের কাছে এক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে জিহাদ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে আসলেন, তিনিও তাঁর সাথে ফিরে আসলেন। দুপুরে তারা সকলে একটি ময়দানে উপস্থিত হলেন, যেখানে প্রচুর কাটাবিশিষ্ট গাছপালা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করলেন। লোকেরা গাছের ছায়া লাভের জন্য এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা

গাছের ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করে নিজ তরবারীটি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা সকলে কিছুটা ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকলেন। সে সময় তার কাছে ছিল এক বেদুইন। তিনি বললেল, আমি ঘুমিয়ে আছি আর এ লোকটি আমার ওপর তরবারি উত্তোলন করেছে। আমি জেগে দেখি তার হাতে খোলা তরবারি। সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে? আমি তিন বার এর উত্তরে বললাম, "আল্লাহ"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। তিনি বসে পড়লেন।"[5]

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

[5] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এক. নজদ এলাকার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযান পরিচালনা করেছেন। হাদীস ও ইতিহাসে এটা যাতুর রিকা‘ অভিযান বলে পরিচিত।

দুই. হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যাতুর রিকা‘ যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে একাকি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন এক মুশরিক ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিল, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহ। তখন তার হাত থেকে তরবারিটি নিচে পড়ে যায়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। আর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

তিন. বর্ণিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রমণকারীকে কোনো প্রকার প্রশ্রয় না দিয়ে, কোনো নম্রতা বা দুর্বলতা প্রদর্শন না করে উত্তর

দিয়েছেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। এটি আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল করার একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত। একটি মহান আদর্শ।

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্বাবাসীর জন্য রহমত। তাই তিনি আক্রমণকারী লোকটিকে কোনো ধরনের শাস্তি দিলেন না। শাস্তি প্রদানে কোনো বাধাও ছিল না। তবু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আমরা যদি নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলোতে একে অপরের প্রতি ক্ষমার নীতি অনুসরণ করতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা অন্য রকম হতে পারত। আমরা সেই রাসূলের উম্মত হয়ে শত্রুদের ক্ষমা করা তো পরের কথা নিজেদের লোকদেরই ক্ষমা করতে পারি না।

হাদীস- ৬. উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سمعْتُ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ: «لَوْ أَنَّكم تتوكَّلونَ على اللَّهِ حقَّ تَوكُّلِهِ لرزَقكُم كَما يرزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِماصاً وترُوحُ بِطَاناً»

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযক দেবেন যেমন তিনি রিযক দেন পাখিদের। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[6]

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. হাদীসে সত্যিকার তাওয়াক্কুল করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

---

[6] তিরমিযী।

দুই. সত্যিকার তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ পাখিদের মত রিযক দেবেন। যাদের রিযিক অন্বেষণে দুঃশ্চিন্তা ও হা হুতাশ করতে হয় না। আল্লাহ তা‘আলা নিজেই বলেছেন:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾ [الطلاق: ٣]

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৩]

তিন. পাখিরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা রিযিক অন্বেষণে সকালে বেরিয়ে পড়ে। অতএব, তাওয়াক্কুল অর্থ বসে থাকা নয়। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নামই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। যেমন আমরা দেখি এ পরিচ্ছেদে আলোচ্য হামরাউল আসাদ অভিযানে আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম কাফিরদের আক্রমণের কথা শুনে তাওয়াক্কুল করে মদীনাতে বসে

থাকেননি। বরং তারা দুঃখ, কষ্ট আর জখম নিয়ে শত্রুদের ধাওয়া করার জন্য বের হলেন।

হাদীস- ৭. আবু উমারাহ বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «يا فُلان إذَا أَويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُل : اللَّهمَّ أَسْلَمْتُ نفْسي إلَيْكَ، ووجَّهْتُ وجْهِي إِلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمري إِلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظهْرِي إلَيْكَ. رغْبَة ورهْبةً إلَيْكَ، لا ملجَأَ ولا منْجى مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَ، وبنبيِّك الَّذي أرْسلتَ، فَإِنَّكَ إنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وإنْ أصْبحْتَ أَصَبْتَ خيْراً».

وفي رواية في الصَّحيحين عن الْبرَاء قال : قال لي رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إذَا أَتَيْتَ مضجعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَنِ وقُلْ : وذَكَر نحْوَه ثُمَّ قَالَ وَاجْعَلْهُنَّ آخرَ ما تَقُولُ».

“হে ব্যক্তি! তুমি যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমি আমাকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমি আমার মুখ আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। আমার ব্যাপার আপনার কাছে সোপর্দ করলাম। আমার পিঠ আপনার কাছে দিয়ে দিলাম। আর এ সব কিছু আপনার পুরস্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে করেছি। আপনি ব্যতীত কোনো আশ্রয় নেই। আপনি ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় নেই। আমি আপনার কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি যা আপনি নাযিল করেছেন। আপনার প্রেরিত নবীর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

যদি তুমি (এ দো‘আটা পড়ে) এ রাতেই মারা যাও তাহলে ইসলামের ওপর তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি সকালে জীবিত উঠ তাহলে কল্যাণ লাভ করবে।”[7]

---

[7] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

বুখারী ও মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় আছে: বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তুমি তোমার বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন সালাতের অযু করার মতো করে অযু করবে। তারপর ডান কাতে শুয়ে এ দো‘আটি পাঠ করবে...। এটাই যেন তোমার ঐ দিনের শেষ কথা হয়।”

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. নিদ্রা যাবার কিছু দো‘আ আছে। যার একটি হলো:

«اللَّهمَّ أَسْلَمْتُ نفْسي إِلَيْكَ، ووجَّهْتُ وجْهِي إِلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمري إِلَيْكَ، وأَلْجْأْتُ ظهْرِي إِلَيْكَ. رغْبَة ورهْبةً إِلَيْكَ، لا ملجَأَ ولا منْجى مِنْكَ إلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَ، وبنبيِّك الَّذي أَرْسلتَ».

দুই. এ দো‘আটি পাঠের একটি ফযীলত হলো, দো‘আটি পড়ে কেউ যদি নিদ্রা যায়। আর সে রাতে তার মৃত্যু হয়,

তাহলে সে ইসলাম অনুসারী নিষ্পাপ হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেচে যায়, তাহলে সকালে সে কল্যাণ ও বরকত লাভ করবে।

তিন. সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্ত্ততি নিয়ে রাখা এ হাদীসের একটি শিক্ষা।

চার. এ হাদীসে বর্ণিত দো'আর মধ্যে স্বীকারোক্তিগুলোর সবই সত্যিকার তাওয়াক্কুলের ঘোষণা। যেমন, হে আল্লাহ! আমি আমাকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমি আমার মুখ আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। আমার ব্যাপার আপনার কাছে সোপর্দ করলাম। আমার পিঠ আপনার কাছে দিয়েদিলাম। আর এ সব কিছু আপনার শাস্তির ভয়ে এবং পুরস্কারের আশায় করছি। আপনি ব্যতীত কোনো আশ্রয় নেই। আপনি ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় নেই।...

একজন তাওয়াক্কুলকারীর দৃষ্টিভঙ্গি এ রকমই হতে হবে। সারাদিন তো বটেই। নিদ্রা যাবার নিরাপদ মুহূর্তেও তাকে

আল্লাহ তা‘আলার প্রতি তাওয়াক্কুলের চর্চা করতে হবে। এদিক বিবেচনায় হাদীসটি-কে তাওয়াক্কুল বিষয়ে উল্লেখ করা যথার্থ হয়েছে।

পাঁচ. নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-সঙ্কটের সময় যেমন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে থাকে, তেমনি ঘুমাতে যাওয়ার মত নিরাপদ অবস্থায়ও সে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের কথা ভুলে যায় না।

হাদীস- ৮. আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যার পুরো নাম ও পরিচয় হলো, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উসমান ইবন আমের ইবন উমর ইবন কা‘আব ইবন সা‘আদ ইবন তাইম ইবন মুররা ইবন কা‘আব ইবন লুআই ইবন গালেব আল কুরাশি আত তায়মি রাদিয়াল্লাহু আনহু (তিনি ও তার পিতা-মাতা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) তিনি বলেন,

«نظرتُ إلى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ ونَحنُ في الْغَارِ وهُمْ علَى رؤوسنا فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أحَدَهمْ نَظرَ تَحتَ قَدميْهِ لأبصرَنا فقال: «مَا ظَنُّك يا أبا بكرٍ باثْنْينِ اللَّهُ ثالثِهْما».

"আমরা (হিজরতের সময়) গুহায় অবস্থানকালে আমি মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, যখন তারা আমাদের মাথার উপর ছিল। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ যদি এখন নিজের পায়ের নীচে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, "হে আবু বকর! এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ?"[8]

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও ফযীলত জানা গেল। তিনি ও তার মাতা-পিতা

---

[8] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তার বংশ আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশ একই ছিল।

দুই. হিজরতের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন তখন তাদের ধরতে আসা মক্কার মুশরিকরা এতটা নিকটে এসেছিল যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পা দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে মুশরিকরা তাদের দেখতে পায় নি। কারণ, তারা উভয়ে আল্লাহর ওপর এমন তাওয়াক্কুল করেছিলেন যে, আল্লাহকে তাদের তৃতীয়জন বলে বিশ্বাস করেছেন।

তিন. এমন বিপদের মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করতে ভুলে যান নি।

হাদীস- ৯. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত (তার মূল নাম হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া হুযায়ফা আল মাখযুমিয়্যাহ), (তিনি বলেন),

«أن النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إذَا خَرجَ مِنْ بيْتِهِ قالَ : «بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزَلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ »

"নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ ঘর থেকে বের হতেন, বলতেন, "আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি, যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই আর আমাকে যেন পথভ্রষ্ট করা না হয়। আমার যেন পদস্খলন না হয় বা পদস্খলন করা না হয়। আমি যেন কারো ওপর অত্যাচার না করি বা করো দ্বারা অত্যাচারিত না হই।

আমি যেন মুর্খতা অবলম্বন না করি বা আমার সাথে মুর্খতা সুলভ আচরণ না করা হয়।”[9]

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. এ হাদীসে ঘর থেকে বের হবার একটি দো‘আ বর্ণিত হয়েছে। দো‘আটি হলো :

«بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزلَّ، أَوْ أظلِمَ أَوْ أُظلَم، أَوْ أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ»

দুই. ঘরে থাকা অবস্থায় যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে দো‘আ করেছেন, তাওয়াক্কুল করার ঘোষণা দিয়েছেন। তেমনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও তাওয়াক্কুল করে দো‘আ পড়েছেন। তাওয়াক্কুল অবলম্বন করার ঘোষণা

[9] আবু দাউদ, তিরমিযীসহ আরো অনেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ। বর্ণনার এ ভাষা আবু দাউদ থেকে নেওয়া)।

দিয়েছেন। অর্থাৎ ঘরে বাইরে সর্বত্রই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এটা এ হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমরা যেন এমন ধারনা না করি যে, এখন আমরা আমাদের গৃহে খুব নিরাপদে আছি। নিরাপত্তার প্রতি কোনো হুমকি নেই। তাই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার তেমন প্রয়োজন নেই।

তিন. পথভ্রষ্ট হওয়া বা পদস্খলন ঘটা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করেছেন সর্বদা।

চার. যালিম বা অত্যাচারী হওয়া ও মজলুম বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

পাঁচ. মূর্খতাসুলভ আচরণ করা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন। এমনিভাবে কারো থেকে মূর্খতাসুলভ আচরণের শিকার যেন না হতে হয়, সে জন্যও তিনি দো‘আ করেছেন।

হাদীস- ১০. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَالَ يعنِي إذا خَرَج مِنْ بيْتِهِ : بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ، يقالُ لهُ هُديتَ وَكُفِيت ووُقِيتَ، وتنحَّى عنه الشَّيْطَانُ»

"যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলে, 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। খারাপ বিষয় থেকে ফিরে থাকা আর ভালো বিষয়ে সামর্থ্য রাখা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।'

তাহলে তাকে বলা হয়, তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হলো, তোমার জন্য যথেষ্ট হলো, তোমাকে রক্ষা করা হলো। আর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।”[10]

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. ঘর থেকে বের হওয়ার আরেকটি ছোট দো‘আ এ হাদীসে বর্ণিত হলো। দো‘আটি হলো

«بِسْمِ اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ»

দুই. দো‘আটি পাঠের ফযীলত জানতে পারলাম। যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হবার সময় দো‘আটি পড়ে বের হবে, সে সকল বিপদ-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

---

[10] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই প্রমুখ। আবু দাউদের বর্ণনায় আরো আছে যে, এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, যে ব্যক্তিকে হিদায়াত দেওয়া হয়েছে, যার জন্য আল্লাহর রহমত যথেষ্ট করা হয়েছে, যাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে তার ব্যাপারে তোমার করার কী আছে?

তিন. এ দো‘আ পাঠ করলে শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

চার. দো‘আটির মধ্যে তাওয়াক্কুল করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দো‘আটি পাঠ করার সাথে সাথে সকল বিষয়ে ‘আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করলাম’ এ দৃঢ় প্রত্যয় থাকা জরুরী। শুধু মুখে বললাম, ‘আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলাম’, আর অন্তর থাকল উদাসীন, তাহলে কাজ হবে না। এটা যেমন একটি দো‘আ তেমনি ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি।

হাদীস- ১১. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَان أخوانِ عَلَى عهْدِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وكَانَ أَحدُهُما يأْتِي النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، والآخَرُ يحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ للنبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال : « لَعلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে সব সময় আসত আর অন্যজন জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকত। জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত ব্যক্তি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অপর ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযোগকারী কে বললেন, “সম্ভবত তোমাকে তার কারণে রিযক দেওয়া হয়।”[11]

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক. হাদীসে দেখা যায় এক ভাই জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত আর অন্য ভাই জীবিকা অর্জনে কাজ করত না, তবে সে শিক্ষা অর্জনের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসা যাওয়া করত। কিন্তু এটা জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত ভাইয়ের পছন্দ হতো না।

---

[11] তিরমিযী। ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসের সূত্র সহীহ।

তার কথা ছিল, আমি একা কেন উপার্জন করব। এ কারণে সে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নালিশ দিয়েছিল।

দুই. নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি যা অর্জন করে থাক সম্ভবত তা তোমার সেই ভাইয়ের কারণে আল্লাহ দিয়ে থাকেন, যে উপার্জন না করে আমার কাছে আসা যাওয়া করে থাকে।

তিন. যে উপার্জন না করে নবীজির দরবারে যাওয়া আসা করত সে জীবিকার জন্য আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছিল বলে আল্লাহর তার ভাইয়ের মাধ্যমে তাকে রিযিক দিয়েছেন।

চার. এ হাদীস থেকে এ শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য নয় যে, এক ভাই উপার্জন করবে আর অন্যজন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার নামে তার উপার্জন থেকে খেয়ে যাবে। বরং উদ্দেশ্য হলো, কর্ম বন্টন। যদি উভয়ে উপার্জনে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে শিক্ষা অর্জন করবে কে? আবার উভয়ে

যদি নবীজির দরবারে শিক্ষা অর্জনের জন্য আসা যাওয়া করতে লাগে তাহলে উপার্জন করবে কে? তাই একজন উপার্জন করবে আর অন্য জন শিক্ষা অর্জন করবে। যাতে উভয়ে একে অপর থেকে লাভবান হতে পারে।

পাঁচ. জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে দীনি ইলম অর্জনে মনোযোগ দেওয়া অধিকতর ফযীলতের কাজ।

ছয়. যে সকল দুর্বল, অসহায়, প্রতিবন্ধী মানুষকে আমরা লালন পালন করে থাকি তাদেরকে নিজেদের ওপর বোঝা মনে করা মোটেই সঙ্গত নয়। তাদেরকে বোঝা মনে না করে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের একটি মাধ্যম মনে করাই শ্রেয়। এটা এ হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে বলেছেন:

«هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»

“তোমরা তো রিযিক ও সাহায্য পাচ্ছ একমাত্র তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে”।[12]

অর্থাৎ আল্লাহ বহুমানুষকে রিযিক দিয়ে থাকেন তার অধীনস্থ দুর্বল, অসহায় মানুষের কারণে।

সমাপ্ত

[12] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৯৬।

‘আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল: গুরুত্ব ও তাৎপর্য’ এই গ্রন্থে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের ফযীলত ও গুরুত্ব, ইসলামে তাওয়াক্কুলের মর্যাদা ইত্যাদি ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দলীলভিত্তিক বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।